জৈন নীতিতত্ত্ব

(প্রথম অংশ)

জীব বা আত্মার বন্ধন ও মুক্তির আলোচনা ভারতীয় চিন্তাধারায় মুখ্য ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও জীবনের বন্ধন ও মুক্তির আলোচনাকে সাধারণভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক আলোচনা বলা হয়, তবু ভারতীয় দার্শনিক আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আসলে জীবের বন্ধন ও মুক্তি। চার্বাক ভিন্ন সকল দর্শন সম্প্রদায়ই মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করেন। মোক্ষ হলো জীবের বন্ধন ও দুঃখ থেকে নিবৃত্তির অবস্থা। একথা সত্য যে, মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু দুঃখ থেকে নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভই যে জীবের পরম লক্ষ্য সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তাই ভারতীয় দর্শনে ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রধানত জীবের বন্ধন ও মুক্তিকেন্দ্রিক।

জৈনমতে বন্ধন ও মোক্ষ (bondage & liberation)

ভারতীয় দর্শনে বন্ধনের অর্থ নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করা এবং সংসারের দুঃখকে সহ্য করা। জৈনদর্শন (Jainism) অনুযায়ী, কষায়ে লিপ্ত হয়ে জীবের যে বিষয়াসক্তি হয় একেই বলে বন্ধন (bondage), যার ফলে দুঃখ সহ্য করেও জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনাগমন করে। এই গমনাগমনকে বলে আস্রব (flow)। আস্রব অর্থ বহমানতা। আর কষায় (sticky substance) হচ্ছে চিত্তমালিন্য। জীব কষায়ে লিপ্ত হয়ে গমনাগমন করে। ক্রোধ, অভিমান, মোহ, লোভ ও অশুভকে মন্দ-কষায় বলে এবং ক্রোধহীনতা, নিরাভিমান, মোহমুক্তি, নির্লোভতা প্রভৃতি শুভ-কষায়।

কষায়ের চারটি কারণ- (১) মিথ্যা দর্শন- মিথ্যাদর্শন নৈসর্গিক বা প্রাচীন মিথ্যা কর্ম থেকে উৎপন্ন, অথবা উপদেশজ, কিংবা ভ্রান্ত দর্শন শ্রবণ-পঠনের ফলেও উৎপন্ন হতে পারে। (২) ইন্দ্রিয়ের অসংযম; (৩) প্রমাদ; (৪) আস্রব দর্শনের উপায় প্রভৃতির প্রতি আলস্য।

জৈনমতে আস্রব প্রবাহের রাস্তাকে রুদ্ধ করে দেয়াকে সম্বর (stoppage) বলে, যা কিনা গুপ্তি ও সমিতি দ্বারা অর্জন করতে হয়। কায়া বচন এবং মানসিক বিশুদ্ধতা রক্ষাকে বলে গুপ্তি বা গোপনতা। আর সমিতি হচ্ছে সংযম। সমিতির পাঁচটি ভেদ- (১) ঈর্ষা সমিতি- প্রাণীদের রক্ষা করা; (২) ভাষা সমিতি- হিত, পরিচিত এবং প্রিয় ভাষণ; (৩) ঈষণা সমিতি- শুদ্ধ, নির্দোষ ভিক্ষা গ্রহণ করা; (৪) আদান সমিতি- আসন-বস্ত্র গ্রহণ করার সময় ভালোভাবে দেখে নেয়া দরকার যে তাতে প্রাণীহিংসা প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে কি-না; (৫) উৎসর্গ সমিতি অর্থাৎ বৈরাগ্য- জগৎ নীচতা ও মালিন্যে পরিপূর্ণ, তাকে উৎসর্গ (=ত্যাগ) করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্মে যেমন আর্যসত্যের ওপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়, তেমনি জৈনধর্মে মুমুক্ষুর পক্ষে আস্রব ও সম্বর ত্যাজ্য ও গ্রাহ্যকে সবিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। তাই জৈনগ্রন্থে বলা হয়- 'সংসার বা পুনর্জন্মের কারণ হলো আস্রব এবং সম্বর হলো মোক্ষের কারণ। এই-ই হলো মহাবীর (অর্হত)-এর রহস্য-শিক্ষা, জৈনমতের সারকথা, অন্য সব এরই বিস্তার।'

জৈনমতে জন্মান্তরের সঙ্গে যে কর্ম-কষায় সংযুক্ত হয় তাকে বিনাশ বা নির্জরণ করাকে নির্জর (wearing-out) বলে, যা মুণ্ডিত মস্তকে শীত-গ্রীষ্মাদি সহ্য করে কঠোর তপস্যা দ্বারা করতে হয়। কর্ম যখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, আত্মাও তখন শুদ্ধানন্দে উপনীত হয়। একেই বলে মোক্ষ বা কৈবল্য। এ অবস্থায় মুক্ত পুরুষ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শনে- সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী হয়। সংসার ও পুনর্জন্মে জীবের এই কৈবল্যাবস্থা আচ্ছাদিত থাকে অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ থাকে মলিন। মুক্ত জীব তখন ইহলোকের সীমানা ছাড়িয়ে উর্ধ্বে গমন করেন।

(ক) বন্ধন:

অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মতো জৈন সম্প্রদায়ও জীবের দেহধারণ ও দুঃখভোগকেই বন্ধন বলে মনে করে। অর্থাৎ, বন্ধনের অর্থ নিরন্তর জন্ম গ্রহণ করা এবং সংসারের দুঃখকে সহ্য করা। জৈনমতে জীবকে (=আত্মা) স্বভাবত অনন্ত বলা হয়েছে। জীবে অনন্ত জ্ঞান (infinite knowledge), অনন্ত দর্শন (infinite faith), অনন্ত বীর্য (infinite power) ও অনন্ত সুখ (infinite bliss) এই অনন্ত চতুষ্টয় নিহিত আছে। কিন্তু বন্ধন অবস্থায় সমস্ত পূর্ণতা ঢাকা থাকে। মেঘ যেমন সূর্যের প্রকাশকে ঢেকে রাখে তেমনি বন্ধন জীবের স্বাভাবিক গুণকে অভিভূত করে রাখে। জীব ও কর্মের পরস্পর সংযোগ হওয়ার দরুন জীবের তিরোহিত স্বরূপ হচ্ছে বন্ধ।

জীব শরীরের সাথে সংযোগের কামনা করে। শরীরের নির্মাণ পুদ্গলকণাসমূহের দ্বারা হয়। অনন্ত অবয়বযুক্ত পুদ্গলসমূহ সূক্ষ্মরূপে জীবের শরীরে প্রবেশ করে অণুদ্ব্যণুকাদি ক্রমে কর্মরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা বা শক্তি অর্জন করে। মিথ্যাদর্শন (=অবিবেক), অবিরতি (=অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি), প্রমাদ (=ভ্রম), কষায় (মানমোহাদি) প্রভৃতির জন্য এবং যোগ বা আস্রবের দরুন জীব তাদেরকে গ্রহণ করে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়। এটাই হলো বন্ধ। বন্ধের কারণ হচ্ছে ক্রোধাদি প্রবৃত্তি যা অজ্ঞান হতে উৎপন্ন হয়। জৈনাচার্য উমাস্বাতি তাই বলেছেন-

'সকষায়ত্বাৎ জীবঃ কর্মভাবযোগ্যান্ পুদ্গলানাদত্তে স বন্ধঃ' । (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র-৮/২)

অর্থাৎ : কষায় বা বাসনায় আসক্ত জীবদেহ আত্মাকে বন্ধনযুক্ত করে।

অজ্ঞানে অভিভূত হলে জীবে বাসনা উদিত হয়। বাসনা মূলত চার প্রকার- ক্রোধ (anger), মান (pride), লোভ (greed) ও মায়া (infatuation)। এই বাসনাগুলি হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে জীব শরীরের জন্য লালায়িত হয়। জীবের কুপ্রবৃত্তি পুদ্গলকণাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করায় এই কুপ্রবৃত্তিকে কষায় (sticky substance) বলে। জীব কোন্ প্রকার পুদ্গলকণাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে তা জীবের পূর্বজন্মের কর্মানুসারে নিশ্চিত হয়। জীব নিজ কর্ম অনুসারে পুদ্গলকণাকে আকৃষ্ট করে। এভাবে জীবশরীরের রূপরেখা কর্মের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

জৈনমতে আত্মার বন্ধনের প্রধান কারণ যে কর্ম, সেই কর্ম আট প্রকারের- (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম, (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম, (৩) মোহনীয় কর্ম, (৪) বেদনীয় কর্ম, (৫) নামকর্ম, (৬) অন্তরায় কর্ম, (৭) গোত্র কর্ম ও (৮) আয়ুষ্কর্ম।

কর্মগুলিকে জৈন দর্শনে আত্মার আবরণ বলে মনে করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম আত্মাতে ভিন্ন ভিন্ন আবরণ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক কর্মের নামকরণ ফলের অনুরূপ হয়। যেমন, জ্ঞানাবরণীয় কর্ম জ্ঞানকে আবৃত করে, কিন্তু দর্শনাবরণীয় কর্ম দৃষ্টিশক্তিকে আবৃত করে। যে কর্ম জ্ঞানের বাধক হয় তাকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম বলে। যে কর্ম জীবের স্বাভাবিক শক্তিকে রুদ্ধ করে তাকে অন্তরায় কর্ম বলে। যে কর্ম সুখ ও দুঃখের বেদনাকে উৎপন্ন করে তা হচ্ছে বেদনীয় কর্ম। দর্শনে ও চরিত্রে মোহ উৎপন্নকারী কর্মকে যথাক্রমে দর্শনাবরণীয় ও মোহনীয় কর্ম বলা হয়। এদের মধ্যে মোহনীয় কর্ম হচ্ছে প্রবল এবং তা নষ্ট হলে পর অন্যান্য কর্মের নাশ সম্ভব হয়। কৈবল্য বা মোক্ষের প্রতিবন্ধক হচ্ছে এইসব কর্ম। জৈনমতে কর্মফলই নির্ধারণ করে দেয় কোন্ জীব কোন্ পরিবারে জন্মাবে, কোন্ জীব কিরূপ দেহধারণ করবে ইত্যাদি। জৈনরা কর্মগুলিকে 'ভাবকর্ম' ও 'দ্রব্যকর্ম' ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন।

ভাবকর্ম আভ্যন্তরীণ জগতের ব্যাপার। অশুভ চিন্তা বা কুভাবনা হলো ভাবকর্ম। দ্রব্যকর্ম বহির্জাগতিক ও দ্রব্যকেন্দ্রিক। দ্রব্যকর্মই বাস্তবিকপক্ষে পুদ্গলকে আত্মাতে আকৃষ্ট করে। এই আকৃষ্ট পুদ্গলকণাকে কর্মপুদ্গল বলে। এই দুইপ্রকার কর্ম অনুযায়ী আত্মার বন্ধনও দুই প্রকার- ভাববন্ধন (ideal bondage) ও দ্রব্যবন্ধন (real bondage)।

আত্মার আভ্যন্তরীণ কুচিন্তা ও কুভাবনার দ্বারা আত্মার যে প্রাথমিক বন্ধন তা হলো ভাববন্ধন। জীবে ক্রোধ, মান, লোভ ও মায়া এই চার প্রকার কষায়রূপ কুপ্রবৃত্তি বা ভাবকর্ম আত্মার এই ভাববন্ধন ঘটায়। এই ভাববন্ধনের জন্য পুদ্গলের আকর্ষণ ও জীবের দেহধারণ হলো দ্রব্যবন্ধন। যখন পুদ্গলকণা জীবে প্রবৃত্ত হয় সেই বন্ধনকে দ্রব্যবন্ধ বলে। দুধ ও জলের মিশ্রণ এবং গরম লৌহ ও অগ্নির সংযোগের মতো আত্মা ও

পুদ্গালের সংযোগ হয়। এই সংযোগ বা মিলনকে দ্রব্যবন্ধ বলে। ভাববন্ধ হচ্ছে দ্রব্যবন্ধের কারণ। ভাববন্ধের পর দ্রব্যবন্ধের আবির্ভাব হয়।

জৈনমতে তাই আত্মার বন্ধনের কারণ দ্বিবিধ। কষায়রূপ কামনা-বাসনা হলো নিমিত্ত কারণ এবং পুদ্গল পরমাণু হলো উপাদান কারণ। যেহেতু কামনা-বাসনা আত্মাতে পুদ্গল পরমাণুকে আকর্ষণ করে সেহেতু কামনা-বাসনা (ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ)-কে জৈনমতে 'কষায়' বলে-

'কষতি হিনস্তিচ'। অর্থাৎ, যা জীবকে পাপপথে নিয়ে বিনষ্ট করে।

কষায়যুক্ত জীব পুদ্গলপরমাণুকে আকৃষ্ট করে দেহধারণ করে এবং সেই দেহ আত্মাকে আবৃত ও বন্ধনযুক্ত করে। জৈন দর্শনে এরূপ ক্রিয়া 'আস্রব' বলে পরিচিত। এই আবরণের ফলে আত্মার অনন্তজ্ঞান, অনন্তদর্শন বাধাপ্রাপ্ত হয়। আত্মায় পুদ্গলপরমাণুর অনুপ্রবেশকে 'আস্রব' বলা হয়।

'আস্রব' শব্দের অর্থ পীড়া, কষ্ট, দুঃখ। কিন্তু জৈনমতে এখানে আস্রব শব্দটি পারিভাষিক, যার অর্থ জীবের কর্মের আগমনপথ। পথ বা দ্বার ছাড়া কোন বস্তু কোথাও প্রবেশ করতে পারে না। স্থূল শরীরাদি, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কর্ম করা হয়, যাকে যোগও বলা হয়, তা হচ্ছে আস্রব। জলের নিচে অবস্থিত কোন দ্বার থাকলে তার মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত হয় বলে তাকে আস্রব বলে। তেমনি কর্মের দ্বারপথে কর্মস্রোত প্রবেশ করে জীবের সাথে সংযুক্ত হয় বলে কর্মের গতি বা যোগকে আস্রব বলা হয়। আস্রব জীবের স্বরূপ নষ্ট করে বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়। যখন এই পুদ্গলকণা জীবে প্রবিষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাকে বন্ধন বলে।

যা পুণ্যের হেতু তা শুভ, যা পাপের হেতু তা অশুভ। মন দ্বারা শুভ অশুভ ভাবা হয়, বাক্যের দ্বারা শোভন বা অশোভন বলা হয় এবং শরীরের দ্বারা শুভ বা অশুভ কর্ম সম্পাদিত হয়। এই কর্ম জীবের শরীরে প্রবেশ করে, আর এই প্রবেশপথকে আস্রব বলে। কেউ কেউ বলেন, যা জীবকে বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি তা হচ্ছে আস্রব। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে জীবের জ্ঞানবিষয়কে স্পর্শ করে রূপাদির জ্ঞানরূপে পরিণতি হয়। এই যোগ বা আস্রব শুভ ও অশুভ ভেদে দুই প্রকার।

এই শুভ ও অশুভ কর্মের আগমনদ্বার হচ্ছে আস্রব। চরম তত্ত্বের অজ্ঞান ও কামনাদির দরুন কর্মপুদ্গলের জীবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে জৈনগণ আস্রব নামে উল্লেখ করেন। তা অনেকটা বেদান্তে উল্লেখিত অবিদ্যার অনুরূপ। আস্রবের সংযোগবশত কর্মপুদ্গলের দ্বারা সাক্ষাৎ জীবের তিরোহিত স্বরূপ হচ্ছে বন্ধ। বন্ধের রূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের সমান, যা মিলিত হয়ে পরিবর্তন সাধন করে। বদ্ধদশায় জীবেও পরিবর্তন হয় এবং কর্মপুদ্গলেও পরিবর্তন দেখা যায়। উভয়ে পূর্বদশায় থাকে না। আস্রব ও বন্ধের দ্বারা জীব সংসারীরূপে পরিণত হয়ে বিষয় ভোগ করে।

কর্মের দরুন জীব বন্ধ হয়। জৈনদর্শনের কর্মসিদ্ধান্ত অন্যান্য দর্শনের কর্মসিদ্ধান্ত হতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। জৈনমতে কর্ম এক মূর্ত পদার্থ, যা জীবের সাথে যুক্ত হয়ে বন্ধনের সৃষ্টি করে। রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির পাশে আবদ্ধ জীব নানা প্রকার কর্ম করে। ফলে সংসারী জীবের ভাব থেকে কর্মবন্ধ উৎপন্ন হয় এবং এই কর্মবন্ধ হতে রাগদ্বেষভাব উৎপন্ন হয়। এই চক্র অনাদি হলেও কখনো অনন্ত ও কখনো সান্ত (=অন্তবিশিষ্ট) হয়। ভব্য (=এই চক্রের অন্ত করতে সমর্থ) জীবের কাছে এই কর্ম হচ্ছে অনাদি ও সান্ত।

'সর্বদর্শনসংগ্রহে' বলা হয়েছে বন্ধ চার প্রকার- প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভববন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্মের মূল প্রকৃতি অনুসারে বন্ধের যে বিশেষ প্রকার তা হচ্ছে প্রকৃতিবন্ধ। প্রকৃতি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বর্তমান থেকে নানা ক্রিয়া বা পরিণাম উৎপাদন করে, তা হচ্ছে স্থিতিবন্ধ। কর্মপুদ্গলের মধ্যে তাদের কার্যসাধনের যে বিশেষ শক্তি তা হচ্ছে অনুভাব এবং এই অনুভাবজনিত যে বন্ধ তাকে অনুভববন্ধন বলে। কর্মরূপে পরিণত পুদ্গালের দ্ব্যণুকাদিক্রমে যে স্কন্ধ বা সঙ্ঘাত যা অনন্ত প্রদেশ ব্যাপ্ত, জীবাবয়বের বিভিন্ন প্রদেশে তার অনুপ্রবেশকে প্রদেশবন্ধ বলে।

(খ) মোক্ষ:

বন্ধের বিপরীত অবস্থা মোক্ষ। ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের মতোই জৈনমতেও মোক্ষকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করা হয়। কর্মবশে জীব শরীর ধারণ করে নানা দুঃখ ভোগ করে। তা থেকে রেহাই পাবার জন্য সম্পূর্ণ কর্মের ক্ষয় দরকার। মোক্ষ অর্থ হচ্ছে বন্ধ থেকে রেহাই। জৈনমতে জীব ও পুদ্গালের সংযোগের নাম বন্ধন বলে পুদ্গাল হতে জীবের বিয়োগ হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি।

বন্ধের কারণ পুদ্গালকণা জীবের দিকে প্রবাহিত হয়। সেকারণে যে-যাবৎ পুদ্গালকণাকে জীবের দিকে প্রবাহিত হওয়া থেকে প্রতিহত না করা যায় সে-যাবৎ মোক্ষ সম্ভব নয়। কেবল সেরূপ প্রতিরোধ করাই মোক্ষলাভে পর্যাপ্ত নয়। যে-সকল পুদ্গালকণা জীবে পূর্ব থেকে নিজের ঘর বানিয়েছে সে-সকল পুদ্গালকণাকে উন্মূলন করাও অত্যন্ত দরকার। নতুন পুদ্গলকণাকে জীবের দিকে প্রবাহিত হওয়া থেকে রোধ করাকে জৈনপরিভাষায় 'সংবর' (stoppage) বলা হয়েছে। আর পুরাতন পুদ্গলকণাগুলির ক্ষয়কে 'নির্জরা' (wearing-out) বলা হয়েছে। যে দুটি ব্যাপারের দ্বারা আবরণরূপ কর্মপুদ্গালের অপসারণ হয় তাদেরকে যথাক্রমে সংবর ও নির্জরা বলে।

জৈনপরিভাষায় 'আস্রব' (flow) হচ্ছে জীবের চলন। এই আস্রবের নিরোধে কর্মপুদ্গালগুলি জীবে প্রবেশ করে না। তাই আস্রবনিরোধকে সংবর বলা হয়। গুপ্তি, সমিতি প্রভৃতি যে উপায়ের দ্বারা জীবে কর্মের প্রবেশকে প্রতিরোধ করা হয় তা হচ্ছে সংবর। যে আস্রব বা যোগের দ্বারা কর্মপুদ্গাল জীবে প্রবেশ করে তা হতে জীবকে গোপন অর্থাৎ রক্ষা করা হচ্ছে গুপ্তি। গুপ্তি তিন প্রকার- কায়নিগ্রহ, বাগনিগ্রহ ও মনোনিগ্রহ।

প্রাণিপীড়া পরিত্যাগ করে সম্যগভাবে অবস্থান হচ্ছে সমিতি। সমিতি পাঁচ প্রকার- ঈর্ষা, ভাষা, এষণা, উৎসর্গ ও আদানসমিতি। এভাবে কর্মাস্রবের অভাবে সংবর হয়। এজন্যেই বলা হয়-

'আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্'। অর্থাৎ, আস্রব সংসারের হেতু এবং সংবর হচ্ছে মোক্ষের কারণ।

এটিই জৈনমতের সারকথা, বাকি হচ্ছে তার বিস্তার।

নির্জরা দুই প্রকার- ভাবনির্জরা ও দ্রব্যনির্জরা। কামনার পূর্তি সাধন করে কর্মে ক্ষয়কালীন নির্জরাকে ভাবনির্জরা বলে। তারপর জীবে অবস্থিত কর্মপুদ্গলের প্রকৃত বিনাশ হচ্ছে দ্রব্যনির্জরা। আবার অন্যভাবে নির্জরা দুই প্রকার- যথাকাল ও ঔপক্রমিক। যে কালে যে ফলদান করার কথা তা সেই ফলদান করে বিনষ্ট হলে তাকে যথাকাল নির্জরা বলে। কামনা প্রভৃতির পূর্তি সাধন করে কর্মের ক্ষয় হচ্ছে যথাকাল নির্জরা। যখন কর্ম উদয়ের মুহূর্তেই তপস্যার শক্তিতে আপনার ইচ্ছাক্রমে বিনষ্ট হয় তখন তাকে ঔপক্রমিক নির্জরা বলা হয়। উপক্রম বা চেষ্টার দ্বারা বিনাশ হয় বলে এরূপ ঔপক্রমিক নাম হয়েছে। এজন্যেই বলা হয়েছে-

'সংসারবীজভূতানাং কর্মণাং জরণাদিহ।

নির্জরা সম্মতা দ্বেধা সকামাকামনির্জরা।।

স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্ ।'

অর্থাৎ, সংসারের সমস্ত কর্মের বিনাশ হতে নির্জরা লাভ হয়। তা দুই প্রকার- সকাম (ঔপক্রমিক) ও অকাম (যথাকাল)। যারা যম প্রভৃতি অভ্যাস করে তাদের সকাম নির্জরা এবং অন্য প্রাণীদের অকাম নির্জরা লাভ হয়।

মোক্ষের দুটি হেতু সংবর ও নির্জরা। তার মধ্যে সংবরের দ্বারা কর্মপুদ্গলগুলির জীবাত্মায় প্রবেশের অভাব হলে নতুন কর্মের অভাব হয়। এবং সঞ্চিত কর্মের নাশ হয় নির্জরার দ্বারা। এভাবে সমস্ত কর্ম হতে রেহাই হলে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। তাই জৈনাচার্য উমাস্বাতি বলেছেন-

'বন্ধহেত্বভাবনির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষঃ'। (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র-১০/২)

'তদনন্তরমূর্ধ্বং গচ্ছত্যালোকান্তাৎ'। (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র-১০/৫)

অর্থাৎ, বন্ধের কারণের অভাব ও নির্জরার দ্বারা কর্মের নাশ ঘটে মোক্ষ লাভ হয়। তারপর নিরন্তর উর্ধ্বগমন হয়।

...